তৃতীয় অধ্যায়
কবিতাকামিনী কৌতুকায়

অভিলেখসাহিত্য যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠনের এক অপরিহার্য উপাদান, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের রত্নভাণ্ডারেও তাদের বিপুল অবদান রয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি যে, অভিলেখ রচয়িতারা অনেক সময় কাব্যসৃষ্টির খাতিরে ইতিহাসকে কোণঠাসা করে রাখতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং এই কবি প্রজাপতিদের হাতে পড়ে অনেক অভিলেখই হয়ে উঠেছে ইতিহাসগন্ধী অণুকাব্য। ইতিহাসগবেষকদের কাছে না হোক, প্রাচীন সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের রূপরেখা পুনর্গঠনে যাঁরা প্রয়াসী, তাঁদের কাছে এই কবিদের কাব্যবিলাস এক অমূল্য সম্পদ।

এক সময় ম্যাক্স ম্যুলার একটি মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, রামায়ণ মহাভারত ও প্রধান পুরাণগুলির মূলরূপ রচিত হবার পর কালিদাসের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সাহিত্যিক প্রজননের দিক থেকে ছিল বন্ধ্যা। কারণ হিসাবে তিনি ঐ সময়কার কবিদের প্রতিভার দৈন্য, বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত রাজনৈতিক নিরাপত্তা ইত্যাদি যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর মতে এই খরা চলেছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সুবর্ণযুগের আবির্ভাব হয়, তাতে অন্য সব দিকে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও নবজাগরণ ঘটে এবং কালিদাস প্রমুখ অলোকসামান্য প্রতিভাধর কবির উজ্জ্বল আবির্ভাবে ভারতীয় কাব্যের অমানিশা কেটে গিয়ে সুপ্রভাতের সূচনা হয়। কিন্তু ম্যাক্সম্যুলারের এই মতবাদ যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় তা বহু প্রতিযুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকেরা বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, ম্যাক্সম্যুলার কথিত বন্ধ্যা সময় বলে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কিছু ছিল না। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে দুটি অভিলেখের ঃ সংস্কৃতে রচিত প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি এবং প্রাকৃতে রচিত সিরি পুলুমায়ির নাসিক অভিলেখ। দুটি অভিলেখই রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে। দুটিই এমন অসামান্য কাব্যগুণের আধার যে, আমাদের কোন সন্দেহ থাকেনা এগুলি কোন কবির আকস্মিক প্রয়াসের ফল নয় এবং এদের পিছনে রয়েছে সালঙ্কার শিষ্ট কাব্যরচনার দীর্ঘ এক প্রাগিতিহাস।

অতঃপর প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় অভিলেখের কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন "The Cultural Heritage of India" গ্রন্থশ্রেণীর পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত আচার্য

রাধাগোবিন্দ বসাকের অসাধারণ নিবন্ধ "INSCRIPTIONS : THEIR LITERARY VALUE" (পৃ. ৩৯০-৪১৬)।

প্রাকৃত অভিলেখ

. অশোক-অনুশাসনাবলি ঃ— মৌর্যসম্রাট অশোকের (আনু ২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অনুশাসনগুলি সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ব্যেপে ছড়িয়ে আছে। পাথর, স্তম্ভ, গুহাগাত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ, সংখ্যায় ত্রিশটিরও বেশি এই অনুশাসনগুলি অশোকের নিজের কথায় "ধম্মলিপি" (Edicts on Dhamma, law of duty or piety)। প্রাকৃতে লেখা এই সব অনুশাসনের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ হয়েছে এবং অনেক সময় স্থানীয় প্রাকৃত উপভাষার প্রভাব তার ওপর পড়েছে। অবশ্য প্রথমে অনুশাসনের মূল রূপটির খসড়া রাজধানীতেই করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই অনুশাসনগুলির প্রাকৃতভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার ও প্রাচীন হীনযান বৌদ্ধগ্রন্থের পালিভাষার বিশেষ আত্মীয়তা রয়েছে। এতে প্রজাদের উদ্দেশ্যে নৈতিক উপদেশ ও আদেশ, সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব, শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের সেবা, রাজকর্মচারীদের কর্তব্য, নিজের কৃতকর্মের অসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি, সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতে ধর্মবিজয়ের উদাত্ত ঘোষণা—এ সব কিছুই লিপিবদ্ধ হয়েছে অত্যন্ত ঋজু, ওজস্বী, প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষায়। এই ভাষার কোথাও কোন প্রয়াসকৃত কৃত্রিমতা নেই। শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হয়েছে অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে ঃ "এ কেচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে বা" (ভগবান বুদ্ধ যা উচ্চারণ করেছেন সে সবই সুভাষিত)।

অশোক-অনুশাসন থেকে দু একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত—

(১) অয়ি চ মুখমুত বিজয়ে দেবনং প্রিয়স যো ধর্মবিজয়ো (অশোকের কাছে ধর্মের দ্বারা বিজয়ই সকলের সেরা বিজয়)।

(২) হেবং চ খো এয দেখিয়ে ইমানি আসিনবগামীনি নাম অথ চডিয়ে নিঠুলিয়ে কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব হকং মা পরিভসয়িসং (একজন মানুষ দেখবে যে, উগ্রতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, গর্ব, ঈর্ষা থেকে অশুচিতা জন্মায়; তার নিজেকে বলা উচিত আমি যেন কখনো এই সব পাপ না করি)।

অশোক তাঁর চতুর্দশ পর্বত-অনুশাসনে বলেছেন, কোন কোন কথা যে তিনি বারবার লিখিয়েছেন তার কারণ হল ঐ সব বিষয়ের অর্থের মাধুর্য (অস্তি চ এত কং পুন পুন বুতং তস তস অথস মাধুরতায় - অস্তি চ অত্র কং পুনঃ পুনঃ উক্তং তস্য তস্য অর্থস্য মধুরতায়ৈ)। কাব্যতত্ত্বে অর্থগত যে মাধুর্যের কথা বলা হয়েছে তার সম্বন্ধে অতি প্রাচীন উল্লেখ বা ধারণা এখানে রয়েছে বললে ভুল হয় কি?

কুর্‌রম-অভিলেখ ঃ— প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই অভিলেখটি খরোষ্ঠি লিপিতে শাক্যমুনির দেহাবশেষের ধারক একটি ক্ষুদ্র সম্পুটে উৎকীর্ণ। সম্ভবত ২১ শকাব্দ বা ৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ও পেশোয়ারের কুর্‌রম নামক স্থানে প্রাপ্ত এই অভিলেখ আসলে বুদ্ধবচনের উদ্ধৃতি। এতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতিটি বিবৃত হয়েছে। সমসাময়িক পালি অনুশাসনমূলক গ্রন্থে এই নীতির কথা থাকলেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন অঞ্চলে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় এর উদ্ধৃত হওয়ার ঘটনাটি সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখ ঃ— উড়িষ্যার পুরী জেলার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পর্বতে উৎকীর্ণ এই অভিলেখটি প্রাকৃত ভাষায় লেখা গদ্যের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে রচিত এই অভিলেখ আসলে মহারাজ খারবেলের তেরোটি রাজ্যবর্ষের এক কালানুক্রমিক ধারাবিবরণী। আদর্শ ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে অতিকথনবর্জিত নির্মেদ গদ্যে এই বিবরণ রচিত। কালের প্রকোপে এর বহু অংশ এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। তবু যে অংশটুকু পড়া যায় তার ভিত্তিতেই বলা চলে যে, এই অভিলেখের রচয়িতা পরবর্তী আমলের সভাকবিদের স্বভাবসিদ্ধ অলংকৃত সাড়ম্বর শৈলী ব্যবহার না করেও এক আশ্চর্য সাবলীল সুপাঠ্য সুশ্রাব্য এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ঔচিত্যসম্পন্ন ভাষার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই ভাষার সঙ্গে বিশ্রুত বৈয়াকরণ পতঞ্জলির সংস্কৃত গদ্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অভিলেখটি থেকে একটি উদ্ধৃতি— "দুতিয়ে চ বসে অচিতয়িতা সাতকংনিং পছিমদিসং হয়-গজ-নর-রধ-বহুলং দংডং পঠাপয়তি। কন্হবেংণাং গতায় চ সেনায় বিতাসিতি অসিকনগরং। ততিয়ে পুন বসে গংধববেদবুধো দপনতগীতবাদিতসংদসনাহি উসবসমাজকারাপনাহি চ কীড়াপয়তি নগরিং" (দ্বিতীয়ে চ বর্ষে অচিন্তয়িত্বা শাতকর্ণিং পশ্চিমদিশং হয়-গজ-নর-রথ-বহুলং দণ্ডং প্রস্থাপয়তি। কৃষ্ণবেণ্বাগতয়া চ সেনয়া বিত্রাসয়তি ঋষিকনগরম্। তৃতীয়ে পুনঃ বর্ষে গন্ধর্ববেদবুধঃ দর্পনৃত্যগীতবাদিত্রসন্দর্শনৈঃ উৎসবসমাজকারণাভিঃ চ ক্রীড়য়তি নগরীম্।)

নানাঘাট অভিলেখ ঃ— পুনা জেলার নানাঘাটে প্রাপ্ত এই অভিলেখ সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকর্ণির রাজত্বকালে সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে উৎকীর্ণ হয়। এর গদ্যের উপরেও পতঞ্জলির প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। রাজমাতা নায়নিকা বা নাগনিকা (প্রথম শাতকর্ণির মহিষী) সম্বন্ধে যে সব বিশেষণগুলি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে, সেগুলি পড়লে সংস্কৃত গদ্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যে ব্যবহৃত মন্দ্রমন্থর বিশেষণ শ্রেণীর কথা মনে পড়ে ঃ "বেদসিরিমাতুয় সতিনো সিরিমতস চ মাতুয় - - - - নাগবরদয়িনিয় মাসোপবাসিনিয় গহতাপসায়

চরিতব্রহ্মচরিয়ায় দিযব্রতযংএসুংডায় যঞা হুতা ধূপসুগংধায়" (বেদিশ্রিয়ঃ-মাত্রা শক্তেঃ শ্রীমতঃ চ মাত্রা - - - - নাগবরদায়িন্যা মাসোপবাসিন্যা গৃহতাপস্যা চরিতব্রহ্মচর্যয়া দীর্ঘব্রতযজ্ঞশৌণ্ডয়া যজ্ঞাঃ হুতাঃ ধূপনসুগন্ধাঃ)। অভিলেখের শুরুতে ধর্ম, ইন্দ্র, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, চন্দ্র, সূর্য এবং চার লোকপালের বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রারম্ভে থাকবে— "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশো বাপি।" এই অভিলেখের গদ্যশৈলী সরল ও ঋজু। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ প্রায় নেই বললেই চলে। দণ্ডিকথিত বৈদর্ভমার্গের আদি রূপ এই অভিলেখের ভাষায় প্রতিফলিত বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

পুলুমায়ির নাসিক অভিলেখ ঃ— মহারাষ্ট্রের নাসিকে প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের কয়েকটি অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে যেগুলি প্রধানত স্থানীয় প্রাকৃত উপভাষায় রচিত। এই সব অভিলেখের রচয়িতারা যে প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। সাতবাহন রাজা সিরি পুলুমায়ির (আনু. ১৩০-১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) ১৯তম রাজ্যবর্ষে রচিত অভিলেখটির ভাষা প্রাকৃত হলেও মনে হয় যে এর মূলরূপটি যেন সংস্কৃতে ছিল এবং কোন বিদগ্ধ কবি যেন তাকে প্রাকৃতে অনুবাদ করেছেন। মাত্র তিনটি বাক্যে রচিত এই প্রশস্তি প্রাকৃত গদ্যকাব্যের এক চমৎকার নমুনা এবং উত্তরকালে দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণ সংস্কৃত গদ্যের যে শৈলী নির্মাণ করেছিলেন, তার পূর্বাভাস এতে স্পষ্ট বিদ্যমান। সুদীর্ঘ প্রথম বাক্যটিতে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির জননী এবং বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির পিতামহী বলসিরি-(বলশ্রী)র আদেশে একটি গুহানির্মাণের বর্ণনা রয়েছে। এতে প্রায় চল্লিশটি বিশেষণের ব্যবহারে উত্তরকালীন শিষ্ট কাব্যের ধরনে তিন রাজকীয় ব্যক্তিত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় নাতিদীর্ঘ বাক্যটিতে রয়েছে গুহাদানের বর্ণনা। তৃতীয় বাক্যটিও দীর্ঘ নয় এবং তাতেও একটি দানের কথা বলা হয়েছে। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির বর্ণনায় ব্যবহৃত বিশেষণমালা যেন উত্তরকালীন কবিদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষক রাজা বা নায়কের বর্ণনার অগ্রদূত—"সবরাজলোকমংডলপতিগহীতসাসনস দিবসংকরকর বিবোধিত কমলবিমলসদিসবদনস তিসমুদতোয়পীতবাহনস পটিপূংণচদমডলস-সিরীকপিয়দসনসবরবারণবিকমচারুবিকমস ভুজগপতিভোগপীনবাটবিপুলদীঘ-সুদরভুজস ইত্যাদি (সর্বরাজলোকমণ্ডলপ্রতিগৃহীতশাসনস্য দিবসকরকরবিবোধিত-কমলবিমলসদৃশবদনস্য ত্রিসমুদ্রতোয়পীতবাহনস্য পরিপূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসশ্রীকপ্রিয়-দর্শনস্য বরবারণবিক্রমচারুবিক্রমস্য ভুজগপতিভোগপীনবৃত্তবিপুলদীর্ঘসুন্দরভুজস্য - -)। এই বর্ণনায় কবি সমাজে প্রসিদ্ধ উপমার বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। অভিলেখের কবি এই রাজার সঙ্গে পৌরাণিক রাজাদের তুলনা করেছেন এবং তাঁর বিজয়বর্ণনায় পৌরাণিক রূপকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। অনুপ্রাস ও প্রসাদগুণের অক্লিষ্ট প্রয়োগে

প্রশস্তিটি ভাস্বর। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পসমাস বা অসমস্ত পদের নিয়মিত ব্যবহার পাঠককে সব সময় স্বচ্ছন্দবোধ করতে সাহায্য করে। পরবর্তী কালের প্রশস্তিসমূহ ও গদ্যকাব্যে যে রীতি অনুসৃত হয়েছে তার প্রথম আলোটি এখান থেকে বিচ্ছুরিত একথা বলা যেতেই পারে। বিশেষত উত্তরকালীন গদ্যকাব্যে দীর্ঘ সমাসবহুল পদের ব্যবহারজনিত ওজোগুণ ছিল গৌড়মার্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য গদ্যে ওজোগুণের ব্যবহার বৈদর্ভমার্গেও সমাদৃত ছিল। এই প্রশস্তির শৈলীতে একাধারে পালির ছাপ ও সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তা মিলে মিশে রয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষার কবিরাই যে একই কাব্যতত্ত্বের নীতি অনুসরণ করতেন তা বেশ বোঝা যায়। এই প্রশস্তির কবি আদিকাব্য ও পুরাণ বিষয়ে নিষ্ণাত ছিলেন যা তাঁর উপমাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়। তবে সুবন্ধু ও বিশেষত বাণ মহাকাব্য ও পুরাণের রাজাদের সঙ্গে নায়কদের তুলনার ব্যাপারে আরো সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন।

সংস্কৃত অভিলেখ

শক মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখ ঃ—

গুজরাটের জুনাগড়ে প্রাপ্ত এই প্রশস্তি ৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে প্রবল ঝঞ্ঝা ও বর্ষণে সুদর্শন হ্রদের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া ও তার পুনর্নির্মাণ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া প্রথম রুদ্রদামনের কীর্তিকলাপ ও গুণাবলির উপরেও এই প্রশস্তি আলোকপাত করেছে। এ যাবৎ উত্তম কাব্যগুণসম্পন্ন যত সংস্কৃত অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে এটি প্রাচীনতম। এই অভিলেখ কাব্যসৌন্দর্যের দিক থেকে যেকোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। প্রসাদ এবং ওজোগুণসম্পন্ন ঋজু গদ্যে বৈদর্ভী রীতিতে এই প্রশস্তির অজ্ঞাতনামা কবি বিধ্বংসী ঝঞ্ঝার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণভট্টের সৃষ্টিশিল্পের যোগ্য পূর্বসূরী এই গদ্য। এই অভিলেখের আরো একটি সাহিত্যিক গুরুত্ব এই যে, এতে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বস্বীকৃত বিভিন্ন গুণের উল্লেখ রয়েছে। রাজা এবং কবি রুদ্রদামনের গদ্য ও পদ্য রচনার প্রশংসা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—স্ফুট-লঘু-মধুর-চিত্র-কান্ত-শব্দসময়ো-দারালঙ্কৃত-গদ্য-পদ্য-কাব্য-বিধান-প্রবীণেন (রুদ্রদাম্না)। এই বাক্যে রুদ্রদামনের গদ্য পদ্য রচনার যে বিশেষণগুলি উল্লিখিত, তাদের দণ্ডিকথিত বৈদর্ভমার্গের প্রাণস্বরূপ দশগুণের বেশ কয়েকটির সঙ্গে শনাক্ত করা যায়। ঐ সময়ে কাব্যরচনার আদর্শ কী ছিল তা এই বর্ণনা এবং প্রশস্তির গদ্যশৈলী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। শব্দালঙ্কারের মধ্যে বিশেষত অনুপ্রাস ও যমকের সুষম, সুচিন্তিত ও রসানুগুণ ব্যবহারে এই রচনা

প্রকৃত কাব্য হয়ে উঠেছে। এই অভিলেখ থেকে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবর্ণনার অসামান্য কাব্যগুণান্বিত অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল ঃ— "- - - - পর্জ্জন্যেন একার্ণবভূতায়ামিব পৃথিব্যাং কৃতায়াং গিরেরূর্জয়তঃ সুবর্ণসিকতাপলাশিনীপ্রভৃতীনাং নদীনাম্ অতিমাত্রোদ্ধূতৈর্ব্বেগৈঃ সেতুময়মাণানুরূপপ্রতীকারমপি গিরিশিখরতরুতটাট্টালকোপতল্পদ্বারশরণোচ্ছ্রয়বিধ্বংসিনা যুগনিধনসদৃশপরমঘোরবেগেন বায়ুনা প্রমথিত-সলিলবিক্ষিপ্তজর্জ্জরীকৃতাবদীর্ণ- - - -ক্ষিপ্তাশ্মবৃক্ষগুল্মলতাপ্রতানম্ আ নদীতলাদিত্যুদ্‌ঘাটিতমাসীৎ।" এই অভিলেখের ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু কিছু নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে (যেমন, অন্যত্র সংগ্রামেষু, আ গর্ভাৎ প্রভৃতি, অনুপসৃষ্টপূর্ব. . . .) যার কারণ হয়তো প্রাকৃত প্রভাব। অবশ্য তার জন্য এর সাহিত্যগুণের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। শিলার বক্ষে সংস্কৃত শিষ্টকাব্যের প্রথম দৃষ্টান্ত এই প্রশস্তির কবিকে নমস্কার।

রাজা চন্দ্রের মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ অভিলেখ ঃ—

দিল্লীর নিকটস্থ মেহরৌলির লৌহস্তম্ভে খোদিত এই অভিলেখে রাজা চন্দ্রের (অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) শৌর্য বীর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি শ্লোকগুলিতে যুগপৎ একাধিক অলঙ্কারের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অতিশয়োক্তির সঙ্গে রূপক বা উপমার সাঙ্কর্য অবলীলাক্রমে তাঁর লেখনী থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে। ঐ সময়কার প্রশস্তিতে এ ধরনের মিশ্র অলঙ্কারের খুব বেশি প্রচলন ছিল না। অভিলেখের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বীররসের এক আশ্চর্য ঘনীভূত প্রকাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে যেন কারুণ্যেরও ঈষৎ স্পর্শ রয়েছে। বৈদর্ভী রীতিতে রচিত এই অভিলেখ থেকে উদ্ধৃতি—

খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতে র্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্যা কর্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ।
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহান্
অদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপো র্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্।।

এই একটি শ্লোকে উৎপ্রেক্ষা, উপমা ও অতিশয়োক্তির সাবলীল সমন্বয় বলে দেয় যে এই প্রশস্তির অজ্ঞাতনামা রচয়িতা যেকোন প্রথম শ্রেণীর কবির সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য।

হরিষেণরচিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ঃ—

গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত রাজস্তুতি বা বিরুদজাতীয় কাব্যের অনুপম উদাহরণ হল এই প্রশস্তি। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা এতে রয়েছে তার সঙ্গে কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনার সাদৃশ্য দেখে বহু পণ্ডিত বলেন যে কালিদাস হরিষেণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

চম্পূকাব্যের ধরনে রচিত এই প্রশস্তিতে শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা ও স্রগ্ধরার মত দীর্ঘ গম্ভীর ছন্দের সুনিপুণ ব্যবহার সমুদ্রগুপ্তের গগনচুম্বী মহিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথমে ৮টি শ্লোক ও তারপরে গদ্যে রচিত একটি সুদীর্ঘ বাক্য রয়েছে। এই একটি বাক্যের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা, তাঁর সার্বভৌমত্ব, কলানৈপুণ্য, মানবিক গুণাবলি সব কিছুই সন্নিবিষ্ট। হরিষেণের মুন্সিয়ানা এখানেই যে, দীর্ঘ ঐ গদ্য পংক্তিটির কোথাও তিনি ভারসাম্য নষ্ট হতে দেননি। গদ্যে রচিত আরেকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দিয়ে প্রশস্তিটি শেষ হচ্ছে। বৈদর্ভী রীতিতে ওজোগুণসম্পন্ন ভাষায় হরিষেণ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলির যে উজ্জ্বল চিত্র উপহার দিয়েছেন, তা এক কথায় অনুপম। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের যুবরাজ পদে নির্বাচনের যে বর্ণনা এই প্রশস্তিতে রয়েছে তাকে কোনো সজীব চলচ্চিত্রের খণ্ডাংশ বলে বোধ হয়—

আর্য্যো (অথবা, এহ্যে-) হীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকর্ণিতৈ রোমভিঃ
সভ্যেষূচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ।
স্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্বীমিতি।।

অনুপ্রাস, রূপক, উপমার ভাস্বর প্রয়োগে, ক্বচিৎ শ্লেষের ঈষৎ স্পর্শে হরিষেণ সহৃদয়হৃদয়ের আহ্লাদজনক উত্তম কাব্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। দুটি উজ্জ্বল উদ্ধার— "সাধ্বসাধূদয়প্রলয়হেতুপুরুষস্যাচিন্ত্যস্য ভক্ত্যবনতিমাত্রগ্রাহ্যমৃদুহৃদয়স্যানুকম্পাবতোনেকগোশতসহস্রপ্রদায়িনঃ কৃপণদীনানাথাতুরজনোদ্ধরণমন্ত্রদীক্ষাভ্যুপগতমনসঃ সমিদ্ধস্য বিগ্রহবতো লোকানুগ্রহস্য"; "সর্ব্বপৃথিবীবিজয়জনিতোদয়ব্যাপ্তনিখিলাবনিতলাং কীর্ত্তিমিতস্ত্রিদশপতিভবনগমনাবাপ্তললিতসুখবিচরণামাচক্ষাণ ইব ভুবো বাহুরয়মুচ্ছ্রিতঃ স্তম্ভঃ"।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের আরো কিছু বিশিষ্ট অভিলেখ ঃ—

উত্তরকালীন যে সব প্রশস্তিরচয়িতা কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বৎসভট্টি সর্বাগ্রগণ্য। ৪৯৩ ও ৫২৯ মালবযুগ বা কৃতযুগ (যথাক্রমে ৪৩৬ ও ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারা চিহ্নিত **প্রথম কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মনের মান্দাসোর অভিলেখটি** বৎসভট্টির রচনা। এই কবিকে কালিদাসের অব্যবহিত উত্তরসূরী মনে করা হয়। তাঁর নিসর্গবর্ণনায় মেঘদূত ও ঋতুসংহারের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। লাটদেশ, দশপুরনগর, পট্টবায়শ্রেণী এবং ঋতুসমূহের বর্ণনায় বৎসভট্টি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেছেন। ৪৪টি শ্লোকে রচিত এই অভিলেখে ১২টি ছন্দ ব্যবহৃত। কালিদাসের মতই বৎসভট্টি প্রেমিকদের জন্য বিশেষ বিশেষ ঋতুর তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করেছেন। এই অভিলেখের ৩১ নম্বর শ্লোকে ঋতুসংহারের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়—

- - - - দরভাস্করাংশুবহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে।
চন্দ্রাংশুহর্ম্যতলচন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে।।
- - - - কালে - - - -। ইত্যাদি।

দশপুর ও লাটদেশের বর্ণনা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় মেঘদূতকাব্যে বিভিন্ন পুরীর বর্ণনাকে। পদ্যে ওজোগুণ অর্থাৎ দীর্ঘসমাসের ব্যবহার গৌড়মার্গসম্মত (তু. পদ্যেঽপ্যদাক্ষিণাত্যানাম্ ইদমেকং পরায়ণম্, কাব্যাদর্শ ১।৮০)। অদাক্ষিণাত্য কবি বৎসভট্টির কাব্যে এই ওজোগুণের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। একটি সম্পূর্ণ শ্লোকে একটিমাত্র সমাসবদ্ধ পদ রয়েছে এমন দৃষ্টান্তও তাঁর রচনায় আছে। রসের আনুগুণ্য বজায় রেখে তিনি কোমল অথবা পরুষবর্ণের যথাযথ ব্যবহার করেছেন। যেমন ২৬ নম্বর শ্লোকের প্রথম তিন পাদে বন্ধুবর্মনের ঔদার্য ও জ্ঞান বর্ণনায় তিনি সুকুমার বর্ণ প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু চতুর্থপাদে তাঁর শৌর্যবর্ণনার প্রসঙ্গে পরুষবর্ণের বিন্যাসে নিঃসঙ্কোচ— "দ্বিড়্দৃপ্তপক্ষক্ষপণৈকদক্ষঃ"। দণ্ডীর মতে এখানে সমতাগুণের ব্যত্যয় ঘটলেও রসের আনুকূল্য যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রয়োজনমত তিনি যুগ্মক, বিশেষক, কলাপক ও কুলকের ব্যবহার করেছেন।

স্কন্দগুপ্তের ভিতরি স্তম্ভলেখ ও জুনাগড় শিলালেখ এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের ভিতরিতে প্রাপ্ত স্তম্ভলেখটি চম্পূকাব্যের ধরনে লেখা। এতে বিষ্ণুর (শার্ঙ্গিন্) মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও ঐ মূর্তির উদ্দেশ্যে স্কন্দগুপ্তের দ্বারা একটি গ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে প্রাচীন ও বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের সেতু পুনর্নির্মাণের বর্ণনা রয়েছে। এর প্রথম অংশে ৩৯টি শ্লোক রয়েছে যাকে কবি বলেছেন "গ্রন্থ"। দুটি অভিলেখেরই ছন্দোবৈচিত্র্য, অলঙ্কারপ্রয়োগনৈপুণ্য, ভাষার ঋজুতা ও স্বচ্ছতা এবং বৈদর্ভী রীতির ব্যবহার প্রমাণ করে যে এর রচয়িতা কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দৃষ্টান্ত—

বিচলিতকুললক্ষ্মীস্তম্ভনায়োদ্যতেন
ক্ষিতিতলশয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা।
সমুদিতবলকোশান্ পুষ্যমিত্রাংশ্চ জিত্বা
ক্ষিতিপচরণপীঠে স্থাপিতো বামপাদঃ।। (ভিতরি স্তম্ভলিপি)।

ইমাশ্চ যা রৈবতকাদ্ বিনির্গতাঃ
পলাশিনীয়ং সিকতাবিলাসিনী।
সমুদ্রকান্তা শিরবন্ধনোযিতাঃ
পুনঃ পতিং শাস্ত্রযথোচিতং যযুঃ।। (জুনাগড় অভিলেখ)।

রেশমশিল্পীদের অভিলেখটি ছাড়াও মান্দাসোরে আরো কয়েকটি অভিলেখ পাওয়া গেছে যেগুলি উচ্চস্তরের কাব্যগুণের আধার। তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

যশোধর্মনের মান্দাসোর শিলাস্তম্ভ অভিলেখ ঃ—

কবি বাসুল রচিত এই প্রশস্তিতে যশোধর্মনের (আনু. ৫২৫-৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) গৌরবগাথা বর্ণিত। স্তম্ভের বর্ণনায় কবি যেন হরিষেণের দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম আটটি শ্লোক দীর্ঘ মন্দ্র মন্থর স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। নবমটি মিতাক্ষর অনুষ্টুভ্ বা শ্লোক ছন্দে। এই প্রশস্তির কবি বাসুল সাধারণ মানের চেয়ে উচ্চস্তরের হলেও স্বতঃস্ফূর্ত কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি বা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির কাব্য সম্পদের সঙ্গে এই অভিলেখের কাব্যগুণের তুলনাই চলে না। অলঙ্কারতত্ত্বানুসারী শিষ্ট মহাকাব্যের গতানুগতিকতায় তাঁর রচনা অনেক সময় ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত। এই প্রশস্তি থেকে একটি শ্লোক—

স্থাণোরন্যত্র যেন প্রকৃতিকৃপণতাং প্রাপিতং নোত্তমাঙ্গং
যস্যাশ্লিষ্টো ভুজাভ্যাং বহতি হিমগিরির্দুর্গ্গশব্দাভিমানম্।
নীচৈস্তেনাপি যস্য প্রণতিভুজবলাবর্জ্জনক্লিষ্টমূর্দ্ধা
চূড়া পুষ্পোপহারৈস্মিহিরকুলনৃপেণার্চ্চিতং পাদযুগ্মম্।।

মান্দাসোরে প্রাপ্ত আরো দুটি অভিলেখও কাব্যগুণের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হল **প্রভাকরের সময়কার মান্দাসোর প্রস্তরলেখ** (৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কবি রবিল রচিত এই অভিলেখে অনুপ্রাস, রূপক, উপমা, উল্লেখ প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কারের প্রশংসনীয় ব্যবহার বলে দেয় যে ইনি উত্তম কবির মর্যাদা পাবার যোগ্য। উল্লেখ অলঙ্কারের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত—

দীনে ধনেশং ধিয়ি বাচি চেশং
রতৌ স্মরং সংযতি পাশপাণিম্।
যমর্থিবিদ্বৎপ্রমদারিবর্গ্গা—
স্সন্তাবয়াংচক্রুরনেকধৈকম্।।

অন্য একটি অভিলেখ হল **যশোধর্মন্ ও বিষ্ণুবর্ধনের ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের মান্দাসোর অভিলেখ**। এর ৩২ টি শ্লোক বিচিত্র শব্দালঙ্কারে ঝঙ্কৃত এবং মধ্যে মধ্যে উপমা উৎপ্রেক্ষা সমাসোক্তি ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। দুএকটি উদাহরণ—

সৃজতু ভবসৃজো বঃ ক্লেশভঙ্গং ভুজঙ্গঃ; অথ জয়তি জনেন্দ্রঃ শ্রীযশোধর্মনামা (অনুপ্রাস); হবির্ভুজ ইবাধ্বরান্.....তনয়াং স্ত্রীনজীজনৎ (উপমা); কস্মিন্ কালে

কলমৃদুগিরাং কোকিলানাং প্রলাপা / ভিন্দন্তীব স্মরশরনিভাঃ প্রোষিতানাং মনাংসি (উৎপ্রেক্ষা + সমাসোক্তি)।

প্রসিদ্ধ বহু ছন্দের ব্যবহার কবি করেছেন, যেমন, আর্যা, ইন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, মন্দাক্রান্তা, মালিনী, বসন্ততিলক, শার্দূলবিক্রীড়িত, শালিনী, শিখরিণী, স্রগ্ধরা।

এই আলোচনায় **মিহিরকুলের (৫১৫-৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) গোয়ালিয়র প্রস্তরলেখটির** উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। কেশবরচিত এই অভিলেখে ১৩টি শ্লোক রয়েছে। আর্যা, শার্দূলবিক্রীড়িত ও মালিনী ছন্দে রচিত এই শ্লোকগুলিতে সযত্নে অর্জিত কবিপ্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর মুদ্রিত। বিশেষত অলঙ্কার ব্যবহারে কবির প্রৌঢ়ি লক্ষণীয়। দু একটি উদাহরণ ঃ—

রূপক ঃ ভুবন ভবনদীপঃ শর্বরীনাশহেতুঃ, শশিরশ্মিহাসবিকসিতকুমুদোৎপল-গন্ধ শীতলামোদে;

পরিণাম ঃ তপিতকনকবর্ণৈরংশুভিঃ পঙ্কজানাং
অভিনবরমণীয়ং যো বিধত্তে স বোহ্যাৎ।।

গুপ্তযুগের অন্য যে সব অভিলেখকে আমরা কাব্যৈশ্বর্যের দিক থেকে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বলতে পারি, তাদের কয়েকটি হল—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলেখ, উদয়গিরি গুহালেখ, সাঁচী অভিলেখ, প্রথম কুমার গুপ্তের বিলসড (উত্তরপ্রদেশ) প্রস্তরস্তম্ভলেখ, বিশ্ববর্মনের গঙ্গধার (রাজস্থান) প্রস্তরস্তম্ভলেখ ইত্যাদি। সাধারণভাবে এই অভিলেখগুলিকে মধ্যমমানের কবিত্বশক্তির দৃষ্টান্ত বলা যায়। তবে বৈদর্ভমার্গানুসারে রচিত এই অভিলেখগুলির ভাষা স্বচ্ছন্দ, ঋজু ও আড়ম্বরমুক্ত। এদের মধ্যে গঙ্গধার অভিলেখের (৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) শৈলীতে পূর্বতন অভিলেখগুলির তুলনায় কাব্য উপাদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও উৎকর্ষের ছাপ রয়েছে।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী কালের অভিলেখগুলিতে রীতি, শৈলী ও ভাষার এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত যে সব অভিলেখ আমরা পাই, তাদের বৈশিষ্ট্য হল পৌরাণিক উল্লেখের প্রাচুর্য, অলঙ্কারের আড়ম্বর ও দীর্ঘ-জটিল ছন্দের প্রতি পক্ষপাত। ভট্টি-ভারবি-মাঘের মত মহাকাব্যরচয়িতা এবং দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণের মত গদ্যকবিদের প্রভাবই এজন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। কাব্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর শোভা সম্পাদনের বিষয়ে এই যুগের কবিরা বিশেষ যত্নবান। শ্লেষ এবং বিরোধাভাসের মত দুরূহ অলঙ্কারের ব্যবহার এঁদের রচনায় অবিরল। অভিলেখসাহিত্যে এই ধরনের রচনার উদাহরণরূপে উল্লেখযোগ্য হল—বলভীর (কাথিয়াবাড়) মৈত্রকদের শাসনসমূহ; হর্ষের বাঁশখেরা (উত্তরপ্রদেশের শাজাহানপুরের কাছে) ও মধুবন (উত্তরপ্রদেশ) তাম্রশাসন;

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর (শ্রীহট্ট) তাম্রশাসনসমূহ; রবিকীর্তি রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল (কর্ণাটকের বিজাপুরে) প্রশস্তি; আদিত্যসেনের আফসড (গয়া) প্রশস্তি; লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন, সমতটের শ্রীধারণরাতের কৈলান (ত্রিপুরা) তাম্রশাসন।

মৈত্রক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটারকের বর্ণনায় বলা হচ্ছে—

"প্রতাপোপনতদানমানার্জ্জবার্জিতানুরাগানুরক্তমৌলভৃতশ্রেণীবলাবাপ্তরাজ্যশ্রীঃ"; রাজা গুহসেনের বর্ণনা— "রূপকান্তিস্থৈর্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যবুদ্ধিসম্পদ্‌ভিঃ স্মরশশাঙ্কা-ধিরাজোদধিত্রিদশগুরুধনেশানতিশয়ানঃ"। এই ধরনের বর্ণনা এই বংশের অভিলেখগুলিতে অবিরল। বিশেষত রাজবিশেষণগুলি কবির অনুপ্রাস, শ্লেষ ইত্যাদি অলঙ্কার এবং রাজনীতি, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

নিধনপুর শাসনগুলিতে আর্যা ছন্দ ও গদ্যের মিশ্রণে সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মন্ ও ভাস্করবর্মনের বর্ণনা আমাদের বাণের পাঞ্চালী রীতি স্মরণ করায়। কবি যে রসের আনুগুণ্য বজায় রেখে অনুপ্রাসের ব্যবহারে সিদ্ধ ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত— "শ্রুত শৌর্য্যধৈর্য্যশৌটীর্য্যঃ"।

এ যুগের যে সব অভিলেখ বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে, তার মধ্যে প্রথম হল **দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি**। এটি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তির দ্বারা রচিত হয়। এতে আর্যা, আর্যাগীতি, বংশস্থবিল, শ্লোক ইত্যাদির মত মিতাক্ষর ছন্দের পাশাপাশি শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরার মত দীর্ঘ লীলায়িত ছন্দও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সৌষম্য বজায় রেখে প্রযুক্ত হয়েছে। কবি চমৎকার একটি যমকের আশ্রয়ে নিজের পরিচিতি ঘোষণা করেছেন— "রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাস-ভারবিকীর্ত্তিঃ"। তাঁর এই দাবির যাথার্থ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা দেখি যে, কালিদাস বা ভারবির মত স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রতিভা তাঁর নেই বটে, কিন্তু কাব্যতত্ত্ব ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত। আর কালিদাসের রঘুবংশ ও ভারবির কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের কাছে তাঁর ঋণ অতি স্পষ্ট। শব্দ এবং রূপকল্পের ব্যবহারে তিনি অনেক সময় এই দুটি মহাকাব্য থেকে প্রায় আক্ষরিকভাবে ঋণগ্রহণ করেছেন। যদিও "নাস্ত্যচৌরঃ কবিঃ কশ্চিৎ", তবু প্রতিভার অলৌকিক স্পর্শে শ্রেষ্ঠ কবিরা সেই চৌর্যকে প্রায় মৌলিক সৃষ্টির মর্যাদা দিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, রবিকীর্তির সেই প্রতিভা ছিল না। যা নিয়েছেন তার নবায়ন ঘটাতে তিনি ব্যর্থ। রাজা কীর্তিবর্মার বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত যমক "পৃথুকদম্বকদম্বকদম্বকম্" এর উৎস ভারবির "পৃথুকদম্বকদম্বকঃ"। আবার রবিকীর্তির

"কাবেরীদৃতশফরীবিলোলনেত্রা
চোলানাং সপদি জয়োদ্যতস্য যস্য।
প্রশ্চোতন্মদগজসেতুরুদ্ধনীরা
সংস্পর্শং পরিহরতি স্ম রত্নরাশেঃ।।"

—এই শ্লোক রঘুবংশের নিম্নলিখিত অসামান্য শ্লোকটির অক্ষম অনুকরণ—

"স সৈন্যপরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরী সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ।।"

কালিদাস ও ভারবির কাছে রবিকীর্তির ঋণ প্রসঙ্গে Epigraphia Indica-র ষষ্ঠ খণ্ডে কীলহর্ণের আলোচনা দ্রষ্টব্য। অবশ্য রবিকীর্তি যে আদৌ উচ্চস্তরের কবি ছিলেন না এমনটাও বলা ঠিক হবে না। এই প্রশস্তির বহু জায়গায় তাঁর নিজস্ব কবিত্বশক্তির স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। যেমন—

(১) স্ফুরন্‌ময়ূখৈরসিদীপিকাশতৈর্ব্যুদস্য মাতঙ্গতমিস্রসঞ্চয়ম্।
অবাপ্তবান্ যো রণরঙ্গমন্দিরে কটচ্ছুরিশ্রীললনাপরিগ্রহম্।।

(২) পুনরপি চ জিঘৃক্ষো সৈন্যমাক্রান্তসালং
রুচিরবহুপতাকং রেবতীদ্বীপমাশু।
সপদি মহদুদবত্তোয়সংক্রান্তবিম্বং
বরুণবলমিবাভূদাগতং যস্য বাচা।।

(৩) অপরিমিতবিভূতিস্ফীতসামন্তসেনা-
মুকুটমণিময়ূখাক্রান্তপাদারবিন্দঃ।
যুধি পতিতগজেন্দ্রানীকবীভৎসভূতো
ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ।।

(৪) পিষ্টং পিষ্টপুরং যেন জাতং দুর্গমদুর্গমম্।
চিত্রং যস্য কলের্বৃত্তং জাতং দুর্গমদুর্গমম্।।

যুগের দাবি মেনে রবিকীর্তি অনেক সময় জটিল বাক্যবন্ধ ও দুরূহ অলঙ্কার ব্যবহারের প্রবণতা দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনায় অলঙ্কার প্রয়োগের মোহে অনেক সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারেননি। তবু তাঁর যুগের কবিদের অন্যতম সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রথম সারিতেই আসন পারেন।

আদিত্যসেনের আফসড অভিলেখে বিভিন্ন ছন্দে রচিত ত্রিশটি শ্লোক রয়েছে। অতিশয়োক্তির বাহুল্য এবং পৌরাণিক ও অতিরঞ্জিত বর্ণনার প্রতি পক্ষপাত এই প্রশস্তির কাব্যসৌন্দর্যকে কৃত্রিম করেছে।

শ্রী ধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসন গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে গৌড়ী রীতিতে রচিত। দানপ্রাপকের প্রার্থনার বর্ণনাটি কাব্যগুণের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একই রকম সালঙ্কার শিষ্ট কাব্যের রীতি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে লোকনাথের তাম্র শাসন। সুব্বুঙ্গ বিষয়ের আরণ্য অঞ্চলের বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—"মৃগমহিষবরাহব্যাঘ্রসরীসৃপাদিভির্ যথেচ্ছম্ অনুভূয়মানগৃহসম্ভোগগহনগুল্মলতা-বিতানে"। অনুপ্রাস এবং দীর্ঘসমাসখচিত বাক্যবন্ধে সমৃদ্ধ এই শাসন গৌড়ী রীতির রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর দুটি অভিলেখের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বাদাল প্রশস্তি ও বীরদেব প্রশস্তি। নারায়ণপালের সমসাময়িক বাদাল (দিনাজপুর) স্তম্ভলেখে প্রথম চারজন পালসম্রাটের অধীনে যে ব্রাহ্মণ বংশ পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। এই মন্ত্রীদের বিপুল পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা তথা পালসম্রাট দেবপালের গুণগরিমা কীর্তন করতে গিয়ে কবি লৌকিক বর্ণনার সীমা অতিক্রম করেছেন। এই যুগের রচনায় বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে অনুপ্রাস, বিরোধাভাস, শ্লেষ অলঙ্কার। এদের অবিরল ব্যবহার অনেক সময় প্রশস্তির ঐতিহাসিক তথ্যকে আচ্ছন্ন করেছে।

পাটনার ঘোষরাঁবায় প্রাপ্ত বীরদেব প্রশস্তিতেও অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। তবে জটিল অলঙ্কারের ব্যবহারে এই প্রশস্তির কবির বিশেষ রুচি ছিল না। বসন্ততিলক ছন্দটি এঁর বিশেষ প্রিয় বলে মনে হয়। দীর্ঘ ছন্দের মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িত ও মন্দাক্রান্তা ব্যবহার করেছেন কবি। তাঁর রচনাশৈলীর ওপর হাল ও ভবভূতির কাব্যের প্রভাব পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বঙ্গের বর্মন্ বংশীয় রাজা হরি বর্মনের (১০৭৫-১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ) মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি এগারোটি ছন্দে লেখা তেত্রিশটি শ্লোকের একটি চমৎকার কাব্য। কবি হলেন ভবদেবসখা বাচস্পতি মিশ্র। ভবদেবের উপাধি ছিল বালবলভীভুজঙ্গ। বাচস্পতি তাঁর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষত যমক ও শ্লেষ অলঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সে যুগের নিরিখে বাচস্পতি যে একজন প্রতিভাধর কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মণসেনের (আনু. ১১৮৫—১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ) বিখ্যাত সভাকবি উমাপতিধর, জয়দেবের গীতগোবিন্দে যাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে (বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ), রচনা করেছিলেন বিজয়সেনের (আনু. ১৯০৭-১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) দেওপাড়া (রাজশাহি, বাংলাদেশ) প্রশস্তি। বিভিন্ন ছন্দের ছত্রিশটি শ্লোকে রয়েছে তাঁর অসামান্য কবিত্বশক্তির প্রমাণ। গৌড়ী রীতিতে রচিত এই অণুকাব্যের গোষ্পদে যেন মহাকাব্যবারিধির প্রায় নিখুঁত প্রতিবিম্বন ঘটেছে। পঞ্চানন শিবের পাঁচটি আননের হাসির জয়োচ্চারণে যে শ্লোকটিতে এই প্রশস্তির শুরু, তাতে শিব-পার্বতীর দাম্পত্যলীলার এক অতি মধুর ছবি ফুটে উঠেছে—

"বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলিমাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাভি র্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ।।

উমাপতি ব্যাস বাল্মীকিকে তাঁর আদর্শ স্বীকার করেছেন এবং নিজেকে বর্ণনা করতে গিয়ে "পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধি" বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই উচ্চারণ যে বৃথা আত্মশ্লাঘা নয়, তার স্বাক্ষর এই প্রশস্তির প্রায় প্রতিটি শ্লোকেই দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত। দু একটি দৃষ্টান্ত—

(১) যৎসিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈ র্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্লফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃসন্দানদামোরগ—
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ।।
(পরিণাম অলঙ্কারের চমৎকার দৃষ্টান্ত এটি।)

(২) পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্‌গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্কলগ্নোদ্মিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি।।
(রূপক-উপমার সংকর।)

(৩) চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মা করমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেষস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতাগোনসঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্যন্যস্থিরিচ্ছাসমুচিতরচনঃ কল্পকাপালিকস্য।।
(পরিবৃত্তি।)

শব্দচয়নে, অলঙ্কারবিনির্মাণে, রূপকল্পরচনায়, ছন্দোবৈচিত্র্যে, শাস্ত্রজ্ঞানের গরিমায় উমাপতিধর সমসময়ের কবিগোষ্ঠীতে হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরণ করে অধিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের সঙ্গে যাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল, যেমন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি, সেই সব দেশে আবিষ্কৃত অভিলেখগুলিতেও অনেক সময় উল্লেখযোগ্য কাব্য সৌন্দর্যের সন্ধান মেলে। তেমন কয়েকটি অভিলেখের নাম—দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভো কান্ অভিলেখ, কাম্পুচিয়ার নম বেসাঙ্ অভিলেখ, হান চেই অভিলেখ, প্রথম ইন্দ্রবর্মার অভিলেখ সমূহ, ফিমীনকস, প্রোম ও প্রিখান্ অভিলেখ। কাম্পুচিয়ার অভিলেখগুলির রচয়িতারা অনেক সময়ই কালিদাসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। চম্পা (দক্ষিণ আনাম) ও ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, তাইল্যাণ্ড ও মধ্য এশিয়াতে এমন বহু অভিলেখ পাওয়া গেছে, কাব্য হিসেবে যাদের অনাদর করা চলে না। চম্পার অভিলেখগুলি অনেক সময় চম্পূকাব্যের সুন্দর নমুনা। মায়ানমারে আনন্দচন্দ্রের স্রো হঙ (আরাকান) স্তম্ভলেখ (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) সরল ভঙ্গীতে প্রশস্তি রচনার প্রচলিত শৈলী অনুসরণে লেখা।

এতে ব্যাকরণ ও ছন্দের কিছু ত্রুটি আছে। তাইল্যাণ্ডে সুখোদয়ের সময়কার (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর) দুটি পালি অভিলেখ পাওয়া যায় যেগুলি চম্পূরীতিতে লেখা। মধ্য এশিয়ার অভিলেখগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল একটি খরোষ্ঠি লেখ যাতে চারটি বিভিন্ন ছন্দে ধনসঞ্চয় না করার জন্য সনির্বন্ধ মিনতি রয়েছে। এই অভিলেখের কবির অনুপ্রেরণা হল পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও মহাভারত। এর ভাষায় প্রাকৃতের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কয়েকটি ব্যাকরণগত ত্রুটি রয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রধান অবলম্বন ঃ

(১) অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত রাধাগোবিন্দ বসাকের প্রবন্ধ।

(২) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ A Quiescent Chapter of Indian Classical Literature (with special reference to Gupta inscriptions)– Sanskrit and Related Studies ed. by B.K. Matilal and P. Bilimoria, Delhi 1990, (pp. 135-157)